ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

রদ্দুল মুহতার: কিতাবুন নিকাহ

৩০. নিকাহ বা বিবাহ-এর আভিধানিক সংজ্ঞা কী? (ما هو تعريف النكاح لغة؟)
৩১. নিকাহ চুক্তির রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان عقد النكاح؟)
৩২. মুত'আ বা সাময়িক বিবাহের বিধান কী? (ما حكم نكاح المتعة؟)
৩৩. হানাফি মাযহাবে অভিভাবক ছাড়া নারীর বিবাহের বিধান কী? (ما حكم زواج المرأة بدون ولي عند الحنفية؟)
৩৪. বংশগত কারণে বিবাহ করা হারাম এমন মহিলা কারা? (ما هي المحرمات من النسب؟)
৩৫. দুগ্ধপানের কারণে বিবাহ করা হারাম এমন মহিলা কারা? (ما هي المحرمات من الرضاع؟)
৩৬. দুগ্ধপানের কারণে হারাম হওয়ার জন্য কী শর্ত প্রযোজ্য? (ما هو شرط الإرضاع الذي يحقق التحريم؟)
৩৭. আভিধানিক ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মহর (দেনমোহর) কী? (ما هو المهر لغة وشرعا؟)
৩৮. মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل؟)
৩৯. ফাসিদ নিকাহের ক্ষেত্রে মহরের বিধান কী? (ما حكم المهر في النكاح الفاسد؟)
৪০. নিকাহের ক্ষেত্রে কুফু বা সামাজিক সমতা কী? (ما هي الكفاءة في النكاح؟)

৪১. কুফু কি নিকাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত? (هل الكفاءة شرط لصحة النكاح؟)
৪২. নিকাহের ক্ষেত্রে অভিভাবককে শর্ত করার বিধান কী? (ما حكم اشتراط الولي في النكاح؟)
৪৩. নিকাহ চুক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীর বিধান কী? (ما هو حكم الشهادة في عقد النكاح؟)
৪৪. স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারগুলো কী কী? (ما هي حقوق الزوج على زوجته؟)
৪৫. একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান কী? (ما هو حكم التعدد في الزوجات؟)
৪৬. কখন স্ত্রীর নাফাক্বা (ভরণপোষণ) ওয়াজিব হয়? (متى تجب نفقة الزوجة؟)
৪৭. কোন কোন দোষের কারণে ফাসখ (বিবাহ ভঙ্গ) করার ইখতিয়ার সাব্যস্ত হয়? (ما هي أنواع العيوب التي تثبت خيار الفسخ؟) ৪৮. কখন সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হয়? (متى تنتهي العدة بوضع الحمل؟)
৪৯. সাক্ষী ছাড়া সম্পন্ন হওয়া চুক্তির বিধান কী? (ما هو حكم العقد الذي خلا عن الشهود؟)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর : কিতাবুন নিকাহ

৩০. নিকাহ বা বিবাহ-এর আভিধানিক সংজ্ঞা কী? (ما هو تعريف النكاح لغة؟)

উত্তর:

আরবি ‘নিকাহ’ (النكاح) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা ইসলামি শরিয়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আভিধানিক বা ভাষাগত দিক থেকে ‘নিকাহ’-এর একাধিক অর্থ রয়েছে, যা ফকিহগণের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

১. আভিধানিক অর্থ: অভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘নিকাহ’ শব্দের মূল অর্থ হলো— ‘একত্রিত হওয়া’ (الضَّمُّ), ‘মিলিত হওয়া’ (الْجَمْعُ) এবং ‘মিশ্রিত হওয়া’ (التَّدَاخُلُ)। যেমন আরবীতে বলা হয়, ‘নাকাহাতিল আশজার’ অর্থাৎ

গাছগুলো একে অপরের সাথে পেঁচিয়ে গেছে বা মিশে গেছে। আবার বৃষ্টির পানি যখন মাটির সাথে মিশে যায়, তখনও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

২. রূপক ও প্রকৃত অর্থ: হানাফি ফিকহের পরিভাষায়, নিকাহ শব্দের হাকিকি বা প্রকৃত অর্থ হলো 'সহবাস' বা দৈহিক মিলন (اَلْوَطْءُ)। আর এর মাজাজি বা রূপক অর্থ হলো 'আকদ' বা 'চুক্তি' (اَلْعَقْدُ)। অর্থাৎ, মূলত শব্দটি সহবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যেহেতু চুক্তির মাধ্যমেই সহবাস হালাল হয়, তাই চুক্তিকেও নিকাহ বলা হয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, এর মূল অর্থ চুক্তি এবং রূপক অর্থ সহবাস।

৩. শরিয়তের ব্যবহার: পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এটি 'বিবাহ চুক্তি' অর্থে এসেছে, যেমন— "তোমরা বিবাহ করো..." (সূরা নিসা : ৩)। আবার কোথাও এটি 'সহবাস' অর্থে এসেছে, যেমন— "যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ (সহবাস) করে..." (সূরা বাকারা : ২৩০)।

সারকথা হলো, আভিধানিক অর্থে নিকাহ হলো দুটি জিনিসের মিলন বা সংযুক্তি। শরিয়ত এই শব্দটিকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার এমন এক পবিত্র বন্ধনের জন্য নির্ধারণ করেছে, যার মাধ্যমে তারা একে অপরের জন্য হালাল হয় এবং একটি নতুন পরিবার ও বংশধারার সূচনা ঘটে। এটি কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণ নয়, বরং একটি ইবাদত ও সুন্নাত।

৩১. নিকাহ চুক্তির রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان عقد النكاح؟)

উত্তর:

যেকোনো চুক্তি বা 'আকদ' সংগঠিত হওয়ার জন্য তার কিছু মৌলিক স্তম্ভ বা 'রুকন' থাকা অপরিহার্য, যা ছাড়া ওই চুক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী নিকাহ বা বিবাহ চুক্তির রুকনগুলো অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট।

১. হানাফি মাযহাবের অভিমত: হানাফি ফিকহের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' ও অন্যান্য কিতাব অনুযায়ী, নিকাহের মূল রুকন হলো— 'ইজাব' (الإيجاب) এবং 'কবুল' (القبول)।

- **ইজাব (প্রস্তাব):** চুক্তির মজলিসে প্রথম পক্ষ (সাধারণত মেয়ের পক্ষ বা ওলী) থেকে যে কথাটি প্রথমে বলা হয়। যেমন— "আমি আমার মেয়েকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম।"
- কবুল (গ্রহণ): ইজাবের উত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ (সাধারণত ছেলে বা তার প্রতিনিধি) থেকে যে সম্মতিসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন— "আমি কবুল করলাম" বা "আমি গ্রহণ করলাম।"

সুতরাং, হানাফি মতে পাত্র ও পাত্রীর পারস্পরিক সম্মতিসূচক এই দুটি বাক্যই হলো নিকাহের রুকন। পাত্র-পাত্রী নিজেরা রুকন নয়, বরং তারা হলেন আকদের 'মহল' বা স্থান।

২. অন্যান্য মাযহাবের সাথে পার্থক্য: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং অন্যান্য ইমামদের মতে, নিকাহের রুকন কেবল ইজাব-কবুল নয়, বরং এর সাথে 'ওলী' (অভিভাবক) এবং 'সাক্ষী' (শাহিদ) থাকাও রুকনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাদের মতে ওলী ও সাক্ষী ছাড়া বিবাহ বাতিল।

কিন্তু হানাফি মাযহাব মতে, সাক্ষী এবং ওলী থাকা বিবাহের 'শর্ত' (শুরুত), রুকন নয়। শর্ত পূরণ না হলে বিবাহ ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) হতে পারে, কিন্তু রুকন না থাকলে বিবাহ একেবারেই সংঘটিত হয় না। তাই হানাফি ফিকহে ইজাব ও কবুলকেই বিবাহের একমাত্র রুকন হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা একই মজলিসে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক।

৩২. মুত'আ বা সাময়িক বিবাহের বিধান কী? (ما حكم نكاح المتعة؟)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থায়িত্ব (Dawam), বংশবৃদ্ধি এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা। এর বিপরীতে জাহেলি যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'নিকাহে মুত'আ' বা সাময়িক বিবাহের প্রচলন ছিল। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন—এক দিন বা এক সপ্তাহ) কোনো নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে 'মুত'আ' বলা হয়।

হানাফি মাযহাব ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিধান:

হানাফি ফিকহ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো— নিকাহে মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ীভাবে হারাম এবং বাতিল। এটি জিনা বা ব্যভিচারের নামান্তর।

দলিল ও প্রেক্ষাপট:

রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারের যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের সময় বিশেষ প্রয়োজনে মুত'আ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিদায় হজ্জ বা তার আগেই তিনি তা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। হাদিসে এসেছে:

"হে লোকসকল! আমি তোমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করেছেন।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফতকালে ঘোষণা করেছিলেন যে, "যদি আমি কাউকে মুত'আ করতে দেখি, তবে তাকে জিনার শাস্তি (রজম বা পাথর মেরে হত্যা) দেব।" সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন।

বর্তমান হুকুম:

বর্তমানে শিয়া সম্প্রদায় ছাড়া মুসলিম উম্মাহর কোনো মাযহাব মুত'আকে বৈধ মনে করে না। হানাফি মতে, যদি কেউ টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করে এবং 'নিকাহ' শব্দ ব্যবহার না করে 'মুত'আ' শব্দ ব্যবহার করে, তবে সেই বিবাহ বাতিল হবে এবং তাদের সম্পর্ক জিনা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি 'নিকাহ' শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু সময় নির্দিষ্ট করে (নিকাহে মুওয়াক্কাত), তবে হানাফি মতে সেটিও বাতিল। কারণ বিবাহের চিরস্থায়ীত্বের শর্ত এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে।

৩৩. হানাফি মাযহাবে অভিভাবক ছাড়া নারীর বিবাহের বিধান কী? (ما حكم زواج المرأة بدون ولي عند الحنفية؟)

উত্তর:

নারীর বিবাহে 'ওলী' বা অভিভাবকের (পিতা, দাদা, ভাই ইত্যাদি) ভূমিকা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবে অভিভাবক ছাড়া নারীর বিবাহ শুদ্ধই হয় না। তাদের দলিল হলো হাদিস— "অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।" কিন্তু হানাফি মাযহাব এ ক্ষেত্রে কুরআন

ও হাদিসের আলোকে নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অধিকারবান্ধব মত পোষণ করে।

হানাফি বিধান:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া অনুযায়ী— কোনো স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগা) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেলা) নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করতে পারেন। যদি তিনি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে সেই বিবাহ 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) এবং 'নাফিজ' (কার্যকর) হবে।

শর্ত ও বিশ্লেষণ:

১. কুফু বা সমতা: হানাফি মতে, নারী যদি ওলী ছাড়া বিবাহ করে, তবে শর্ত হলো পাত্রকে অবশ্যই ওই নারীর 'কুফু' বা সমকক্ষ হতে হবে। যদি পাত্র কুফু না হয় (যেমন—সামাজিকভাবে নিচু বা অসৎ চরিত্রের), তবে ওলীদের অধিকার আছে সেই বিবাহ মেনে না নেওয়ার। তারা কাজীর মাধ্যমে বিবাহ ভেঙে দিতে পারে।

২. হাদিসের ব্যাখ্যা: হানাফিগণ "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নেই" হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'নেই' দ্বারা 'পরিপূর্ণতা নেই' বোঝানো হয়েছে, 'বৈধতা নেই' নয়। অর্থাৎ, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করা অনুচিত বা অপূর্ণাঙ্গ, কিন্তু বাতিল নয়।

৩. যুক্তি: প্রাপ্তবয়স্ক নারী যেমন নিজের সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে অভিভাবক ছাড়াই, তেমনি নিজের জীবনের সিদ্ধান্তও (বিবাহ) নিতে পারে। এটি তার মানবিক ও আইনি অধিকার। তবে নাবালিকা হলে অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না।

৩৪. বংশগত কারণে বিবাহ করা হারাম এমন মহিলা কারা? (ما هي المحرمات من النسب؟)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে রক্ত বা বংশীয় সম্পর্কের কারণে নির্দিষ্ট কিছু নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে চিরস্থায়ীভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র

কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা এদের তালিকা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হানাফি ফিকহে এদেরকে 'মুহাররামাত মিনান নাসাব' বলা হয়। বংশগত কারণে হারাম নারীরা মোট সাত প্রকার:

১. মা (আল-উম্মাত): নিজের মা এবং মায়ের দিকের ও বাবার দিকের ওপরের সকল নারী (যেমন—নানি, দাদি, পরদাদি)।

২. মেয়ে (আল-বানাত): নিজের ঔরসজাত মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের সকল নারী (যেমন—নাতনি, পুতনি)।

৩. বোন (আল-আখাওয়াত): আপন বোন (সহোদরা), বৈমাত্রেয় বোন (সৎ মায়ের পেটের) এবং বৈপিত্রেয় বোন (সৎ বাবার ঔরসের)।

৪. ফুফু (আল-আম্মাত): বাবার আপন বোন, বাবার সৎ বোন এবং ওপরের দিকের ফুফুরা (বাবার ফুফু, দাদার ফুফু)।

৫. খালা (আল-খালাত): মায়ের আপন বোন, মায়ের সৎ বোন এবং ওপরের দিকের খালারা (মায়ের খালা, নানির খালা)।

৬. ভাইজি (বানাতুল আখ): নিজের ভাইয়ের (আপন বা সৎ) মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের কন্যারা।

৭. ভাগ্নি (বানাতুল উখত): নিজের বোনের (আপন বা সৎ) মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের কন্যারা।

এই সাত শ্রেণীর নারীর সাথে বিবাহ করা কেবল হারামই নয়, বরং জঘন্যতম অপরাধ এবং ইনসেস্ট (Incest) হিসেবে গণ্য। এদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েজ এবং এরা মাহরাম হিসেবে গণ্য হন।

৩৫. দুগ্ধপানের কারণে বিবাহ করা হারাম এমন মহিলা কারা? (ما هي المحرمات من الرضاع؟)

উত্তর:

ইসলামে রক্তের সম্পর্কের মতো দুধের সম্পর্কও অত্যন্ত পবিত্র ও শক্তিশালী। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "বংশগত কারণে যারা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তারা হারাম হয়।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। অর্থাৎ, শিশুকালে

কোনো মহিলার দুধ পান করার কারণে যে হুরমত বা নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয়, তা বংশীয় হুরমতের মতোই।

দুগ্ধপানের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তারা হলো:

১. দুধ মা: যে মহিলার দুধ শিশু পান করেছে, তিনি ওই শিশুর মা হিসেবে গণ্য হবেন এবং তার সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম।

২. দুধ বোন: দুধ মায়ের নিজের মেয়েরা এবং ওই দুধ মায়ের দুধ পানকারী অন্য মেয়েরা শিশুর দুধ বোন হবে।

৩. দুধ খালা ও ফুফু: দুধ মায়ের বোনেরা (খালা) এবং দুধ মায়ের স্বামীর বোনেরা (ফুফু) হারাম হবে।

৪. দুধ মেয়ে: কোনো পুরুষের স্ত্রী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করায়, তবে ওই শিশু পুরুষের দুধ মেয়ে হবে।

৫. দুধ নানি ও দাদি: দুধ মায়ের মা এবং শাশুড়ি।

৬. দুধ ভাইজি ও ভাগ্নি: দুধ ভাই-বোনের সন্তানরা।

সহজ কথায়, দুধ পান করার পর দুধ মা এবং তার স্বামীর পক্ষ থেকে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়, তা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার মতোই বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে দুধ ভাই বা বোনের অন্যান্য আত্মীয় (যাদের সাথে দুধের সম্পর্ক নেই) তাদের সাথে বিবাহ জায়েজ। যেমন—দুধ ভাইয়ের আপন বোনকে (যে এই মায়ের দুধ খায়নি) বিয়ে করা জায়েজ।

৩৬. দুগ্ধপানের কারণে হারাম হওয়ার জন্য কী শর্ত প্রযোজ্য? (ما هو شرط الإرضاع الذي يحقق التحريم؟)

উত্তর:

দুগ্ধপানের মাধ্যমে হুরমত বা বিবাহ হারাম হওয়ার বিধানটি শর্তসাপেক্ষ। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর জন্য প্রধানত দুটি শর্ত পূরণ হতে হবে—দুধের পরিমাণ এবং শিশুর বয়স।

১. দুধের পরিমাণ (মিকদার):

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, অন্তত ৫ বার তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো—দুধের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, তা হুরমত সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। এমনকি যদি এক ফোঁটা দুধও শিশুর পেটে পৌঁছায়, তবেই সে দুধ সন্তান হয়ে যাবে এবং বিবাহ হারাম হবে। দলিল হিসেবে তারা কুরআনের সাধারণ আয়াত ("তোমাদের দুধমাতা...") পেশ করেন, যেখানে পরিমাণের কোনো শর্ত নেই।

২. শিশুর বয়স (মুদ্দাত):

হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুধ পান অবশ্যই শিশুবয়সে হতে হবে। বড় মানুষের দুধ পানে হুরমত হয় না।

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** শিশুর বয়স **৩০ মাস** (আড়াই বছর) হওয়া পর্যন্ত দুধ পানের সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে পান করলে হুরমত হবে।
- সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) এবং ফতোয়া: হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া বা 'মুফতা বিহি' মত হলো—দুধ পানের মেয়াদ ২ বছর (২৪ মাস)। আল্লাহ বলেন, "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" সুতরাং, ২ বছরের পর দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে না।

সারকথা, ২ বছর বয়সের মধ্যে যেকোনো পরিমাণ দুধ পেটে গেলেই হানাফি মতে দুগ্ধপানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৩৭. আভিধানিক ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মহর (দেনমোহর) কী? (ما هو المهر لغة وشرعا؟)

উত্তর:

বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো 'মহর' বা দেনমোহর। এটি নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও সম্মানের প্রতীক।

১. আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'মহর' (مهر) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো— উপহার, প্রতিদান বা পণ। আরবি ভাষায় এর আরও কিছু প্রতিশব্দ আছে, যেমন— 'সাদাক' (সত্যতার প্রতীক), 'নিহলা' (সন্তুষ্টচিত্তে দান), 'ফরিদা' (নির্ধারিত অংশ) এবং 'আজর' (বিনিময়)। পবিত্র কুরআনে মহরকে 'সাদুকাত' ও 'নিহলা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে এটি সততা ও ভালোবাসার উপহার।

২. শরয়ী বা পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফি ফিকহের পরিভাষায় এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর ভাষ্যমতে, মহরের সংজ্ঞা হলো:

"এমন মাল বা অর্থ, যা বিবাহ চুক্তির কারণে অথবা সহবাসের কারণে স্ত্রীর জন্য স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয়।"

(هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ)

অর্থাৎ, এটি এমন একটি আর্থিক দায়বদ্ধতা যা বিবাহের আকদ হওয়ার সাথে সাথেই স্বামীর ওপর বর্তায়। এটি স্ত্রীর সম্ভ্রম ও তাকে নিজের আয়ত্তে নেওয়ার সম্মানজনক বিনিময়।

৩. বিধান: মহর দেওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব (কারো মতে ফরজ)। বিবাহে মহরের উল্লেখ না থাকলেও তা দিতে হয়। হানাফি মতে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১০ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩০.৬ গ্রাম রুপার দামের সমান। এর চেয়ে কম মহর নির্ধারণ করা জায়েজ নয়।

৩৮. মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل؟)

উত্তর:

মহর নির্ধারণের পদ্ধতি ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: মহরে মুসাম্মা এবং মহরে মিসল। এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মহরে মুসাম্মা (المهر المسمى):

- **সংজ্ঞা:** 'মুসাম্মা' অর্থ নামকৃত বা নির্ধারিত। বিবাহের আকদ বা চুক্তির সময় অথবা আকদের পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ মহর হিসেবে ধার্য করা হয়, তাকে মহরে মুসাম্মা বলে।

- **প্রকৃতি:** এটি একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্ক (যেমন—৫ লক্ষ টাকা বা ১০০ ভরি স্বর্ণ)। এটি ১০ দিরহামের কম হতে পারবে না।

- প্রদেয়: বিবাহ সহীহ হলে এবং নির্ধারিত থাকলে স্ত্রীকে এই মহরই দিতে হয়।

২. মহরে মিসল (مهر المثل):

- **সংজ্ঞা:** 'মিসল' অর্থ দৃষ্টান্ত বা সাদৃশ্য। যদি বিবাহের সময় কোনো মহর নির্ধারণ করা না হয়, অথবা মহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ হয়, অথবা নির্ধারিত মহরটি শরিয়তে অবৈধ (যেমন মদ বা শুকর) হয়, তবে এমতাবস্থায় স্ত্রীকে যে মহর দেওয়া হয়, তাকে মহরে মিসল বলে।

- **নির্ধারণ পদ্ধতি:** স্ত্রীর পিত্রালয়ের বা বংশের অন্যান্য নারী (যেমন—বোন, ফুফু, চাচাতো বোন) যাদের রূপ, গুণ, বয়স, শিক্ষা এবং কুমারীত্ব বা বিধবা হওয়ার অবস্থা স্ত্রীর মতো, তাদের সাধারণত যে পরিমাণ মহর দেওয়া হয়েছে, তার গড় পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

- **পার্থক্য:** মহরে মুসাম্মা চুক্তির মাধ্যমে ঠিক হয়, আর মহরে মিসল সামাজিক স্ট্যাটাস বা প্রথার ভিত্তিতে ঠিক হয় যখন চুক্তি থাকে না।

৩৯. ফাসিদ নিকাহের ক্ষেত্রে মহরের বিধান কী? (ما حكم المهر في النكاح الفاسد؟)

উত্তর:

'ফাসিদ নিকাহ' বা ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ (যেমন—সাক্ষী ছাড়া বিবাহ) যদিও শরিয়তে গুনাহের কাজ এবং এটি বাতিল করে দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু যদি এই বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে, তবে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য শরিয়ত মহরের বিধান রেখেছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ফাসিদ নিকাহে মহরের বিধান নিম্নরূপ:

১. সহবাস বা মিলন হলে:

যদি ফাসিদ নিকাহের পর স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন (দুখুল) হয়, তবে স্ত্রী অবশ্যই মহর পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে মহর নির্ধারণের নিয়মটি একটু ভিন্ন।

- বিধান হলো: **'মহরে মুসাম্মা' (নির্ধারিত মহর) এবং 'মহরে মিসল' (প্রথাগত মহর)—এই দুটির মধ্যে যেটি পরিমাণে কম, স্ত্রী সেটি পাবে।**
- উদাহরণ: যদি তাদের নির্ধারিত মহর থাকে ১ লক্ষ টাকা, কিন্তু স্ত্রীর বংশীয় মহর (মিসল) হয় ১.৫ লক্ষ টাকা, তবে সে ১ লক্ষ টাকা পাবে। আর যদি মিসল হয় ৫০ হাজার টাকা, তবে সে ৫০ হাজার টাকা পাবে। অর্থাৎ, যেটি কম (Al-Aqall), সেটিই তার প্রাপ্য। এটি হানাফি ফিকহের একটি সূক্ষ্ম ইনসাফ।

২. সহবাস না হলে:

যদি ফাসিদ নিকাহের পর সহবাসের আগেই তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে স্ত্রী কোনো মহর পাবে না। এমনকি তাকে কোনো 'মুত'আ' (বিচ্ছেদকালীন উপহার)-ও দিতে হবে না। কারণ ফাসিদ নিকাহে মহর কেবল সম্ভ্রমের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়, যা সহবাস ছাড়া নষ্ট হয়নি।

৩. খিলওয়াত বা নির্জনবাস:

সহীহ বিবাহে নির্জনবাস (খিলওয়াত) সহবাসের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়। কিন্তু ফাসিদ নিকাহে কেবল নির্জনবাসের দ্বারা মহর ওয়াজিব হয় না, প্রকৃত মিলন জরুরি।

৪০. নিকাহের ক্ষেত্রে কুফু বা সামাজিক সমতা কী? (ما هي الكفاءة في النكاح؟)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ একটি পবিত্র ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন। এই বন্ধন যাতে সুদৃঢ় ও শান্তিপূর্ণ হয়, সে জন্য শরিয়ত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল থাকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ফিকহের পরিভাষায় একেই 'কুফু' বা 'কাফাআহ' বলা হয়।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি ভাষায় 'কুফু' (كُفْؤٌ) শব্দের অর্থ হলো সমকক্ষ, সদৃশ, সমান বা জড়ি। পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আর তার সমকক্ষ কেউ নেই।" এখানে সমকক্ষতা অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফি ফিকহের পরিভাষায়, বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীর বিশেষ কিছু গুণাবলিতে স্ত্রীর বা স্ত্রীর পরিবারের সমকক্ষ বা সমান হওয়াকে কুফু বলে। অর্থাৎ, পাত্রকে দ্বীনদারী, বংশমর্যাদা, সম্পদ ও পেশার মতো বিষয়গুলোতে পাত্রীর সমান বা তার চেয়ে উত্তম হতে হবে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

স্বামী ও স্ত্রীর জীবনাচার, রুচি ও সামাজিক অবস্থানে যদি আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকে, তবে সাধারণত সেই সংসারে মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকে না। বিশেষ করে পাত্র যদি পাত্রীর তুলনায় সামাজিকভাবে খুব নিচু স্তরের হয়, তবে তা পাত্রীর এবং তার অভিভাবক বা ওলীদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে শরিয়ত কুফুর বিধান রেখেছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, কুফু কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে ধর্তব্য। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সমকক্ষ হওয়া জরুরি, স্ত্রী স্বামীর সমকক্ষ হওয়া জরুরি নয়। স্বামী যদি স্ত্রীর চেয়ে মর্যাদাবান হয়, তাতে কোনো দোষ নেই; বরং তা সংসারের জন্য ভালো। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর চেয়ে নিচু হয়, তবেই আপত্তি আসে। হানাফি মাযহাবে কুফু যাচাইয়ের জন্য সাধারণত ছয়টি বিষয়কে মানদণ্ড ধরা হয়: বংশ, ইসলাম, দ্বীনদারী, সম্পদ, পেশা এবং বুদ্ধিমত্তা। এর মধ্যে দ্বীনদারী বা তাকওয়া হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৪১. কুফু কি নিকাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত? (هل الكفاءة شرط لصحة النكاح؟)

উত্তর:

কুফু বা সামাজিক সমতা বিবাহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও, এটি বিবাহের বৈধতা বা 'সিহহাত'-এর জন্য অপরিহার্য শর্ত কি না— তা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে সূক্ষ্ম মতভেদ ও বিশ্লেষণ রয়েছে।

হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া অনুযায়ী, কুফু বা সমতা বিবাহ সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। বরং এটি বিবাহ লাজিম বা অপরিহার্য হওয়ার জন্য শর্ত।

এর অর্থ হলো:

১. বিবাহের বৈধতা: যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া এমন কোনো পুরুষকে বিবাহ করেন যিনি তার কুফু বা সমকক্ষ নন (যেমন— কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে কোনো ফাসিক বা নিচু পেশার ছেলেকে বিয়ে করল), তবে হানাফি মতে এই বিবাহটি বাতিল হবে না, বরং বিবাহটি সংগঠিত বা 'সহীহ' হয়ে যাবে।

২. অভিভাবকের অধিকার: বিবাহ সহীহ হলেও, যেহেতু এতে পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাই মেয়েটির অভিভাবকদের (ওলী) এই বিবাহ মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তারা চাইলে কাজীর আদালতে মামলা করে এই বিবাহ বিচ্ছেদ বা 'ফাসখ' করে দিতে পারেন। যতক্ষণ না অভিভাবকরা সন্তুষ্ট হচ্ছেন বা সন্তান জন্ম নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আপত্তি জানানোর অধিকার থাকে।

৩. কুফু হওয়ার শর্ত: যদি পাত্র কুফু হয়, তবে অভিভাবকরা সেই বিবাহ ভাঙতে পারেন না। আর যদি অভিভাবক নিজেই কুফু নয় এমন ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেন, তবে সেই বিবাহ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর এবং তা ভাঙার অধিকার কারো থাকে না।

অন্যান্য মাযহাব:

কোনো কোনো ফকিহের মতে কুফু বিবাহের সহীহ হওয়ারই শর্ত। অর্থাৎ কুফু না হলে বিয়েই হবে না। কিন্তু হানাফি মাযহাব মানুষের আবেগ ও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়ে একে কেবল অভিভাবকের হকের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, বিবাহের মূল অস্তিত্বের সাথে নয়।

৪২. নিকাহের ক্ষেত্রে অভিভাবককে শর্ত করার বিধান কী? (ما حكم اشتراط الولي في النكاح؟)

উত্তর:

বিবাহের ক্ষেত্রে 'ওলী' বা অভিভাবকের (যেমন— বাবা, দাদা, ভাই) ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ফিকহশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি শর্ত কি না, তা হানাফি ও অন্যান্য মাযহাবের একটি মৌলিক পার্থক্যের জায়গা।

হানাফি মাযহাবের বিধান:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিবাহে অভিভাবক থাকা বা অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এটি কেবল নাবালক বা পাগল ব্যক্তির বিবাহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত।

১. প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে: যদি কোনো নারী স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগা) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেলা) হন, তবে তিনি অভিভাবক ছাড়াই নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করতে পারেন। তিনি যদি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে সেই বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ ও সহীহ বলে গণ্য হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "অকুমারী নারী তার নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার।" হানাফিগণ এই হাদিস এবং নারীর আর্থিক স্বাধীনতার ওপর কিয়াস করে এই রায় দিয়েছেন।

২. নাবালক সন্তানের ক্ষেত্রে: ছেলে বা মেয়ে নাবালক হলে তাদের বিবাহ দেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র অভিভাবকের। অভিভাবক ছাড়া তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

অন্যান্য মাযহাবের বিধান:

ইমাম শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী (রহ.)-এর মতে, অভিভাবক ছাড়া কোনো নারীর বিবাহই শুদ্ধ হয় না, চাই তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হোন বা অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের দলিল হলো হাদিস: "অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।"

হানাফিদের জবাব:

হানাফি ফকিহগণ বলেন, ওই হাদিসের অর্থ হলো— অভিভাবক ছাড়া বিবাহ 'পরিপূর্ণ' বা 'মর্যাদাপূর্ণ' হয় না; এর অর্থ এই নয় যে বিবাহ বাতিল হয়। তাই হানাফি মতে, অভিভাবকের সম্মতি নেওয়া মুস্তাহাব ও পারিবারিক সৌন্দর্যের অংশ, কিন্তু এটি বৈধতার আইনি খুঁটি নয়।

৪৩. নিকাহ চুক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীর বিধান কী? (ما هو حكم الشهادة في عقد النكاح؟)

উত্তর:

বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো প্রচার ও প্রমাণ। আর এই প্রচার ও প্রমাণের প্রধান মাধ্যম হলো সাক্ষী। তাই ইসলামি শরিয়তে বিবাহ সম্পাদনের জন্য সাক্ষী থাকা অপরিহার্য।

হানাফি মাযহাবের বিধান:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিবাহ সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাক্ষী থাকা অন্যতম প্রধান শর্ত। সাক্ষী ছাড়া গোপনে ইজাব-কবুল করলে বিবাহ সংঘটিত হবে না।

সাক্ষীর যোগ্যতা ও সংখ্যা:

বিবাহের মজলিসে ইজাব ও কবুল শোনার জন্য ন্যূনতম সাক্ষীর সংখ্যা ও গুণাবলি নিম্নরূপ হতে হবে:

১. সংখ্যা: অন্তত দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী থাকতে হবে। কেবল নারীদের সাক্ষ্য বা একজন পুরুষের সাক্ষ্যে বিবাহ হবে না।

২. ধর্ম: সাক্ষীদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে (যদি পাত্র-পাত্রী মুসলিম হয়)। অমুসলিমের সাক্ষ্য মুসলিম বিবাহে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. জ্ঞান ও বয়ঃপ্রাপ্তি: সাক্ষীদের অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেল) হতে হবে। পাগল বা শিশুর সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়।

৪. শ্রবণ: সাক্ষীদের একই মজলিসে উপস্থিত থেকে বর ও কনের ইজাব-কবুলের শব্দগুলো নিজ কানে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এখানে বিবাহ হচ্ছে।

হিকমত বা কারণ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।" সাক্ষীর উপস্থিতি বিবাহকে একটি সামাজিক ও আইনি চুক্তির রূপ দেয়। এটি ভবিষ্যতে বিবাহ অস্বীকার করা বা সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া রোধ করে। গোপনে বা সাক্ষীবিহীন বিবাহকে হাদিসে 'ব্যভিচারিণীদের বিবাহ' বলে নিন্দা করা হয়েছে। তাই হানাফি মতে, সাক্ষী উপস্থিত থাকা বিবাহের রুকন না হলেও এটি সিহহাত বা বৈধতার অপরিহার্য শর্ত।

৪৪. স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারগুলো কী কী? (ما هي حقوق الزوج على زوجته؟)

উত্তর:

পারিবারিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার জন্য আল্লাহ তাআলা স্বামীকে পরিবারের কর্তা বা 'কাওয়াম' নিযুক্ত করেছেন। এই দায়িত্ব পালনের স্বার্থে শরিয়ত স্ত্রীর ওপর স্বামীর কিছু নির্দিষ্ট অধিকার বা হক সাব্যস্ত করেছে, যা আদায় করা স্ত্রীর ধর্মীয় কর্তব্য।

স্বামীর প্রধান অধিকারগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আনুগত্য (ইতা'আত): শরিয়তসম্মত সকল কাজে স্বামীর নির্দেশ মান্য করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব। যতক্ষণ স্বামী ইসলামের বিরোধী কোনো আদেশ না দেবে, ততক্ষণ তার কথা শোনা ও মানা ইবাদতের শামিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে নারীদের বলতাম স্বামীদের সিজদা করতে।"

২. গৃহের হেফাজত: স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর-বাড়ি, সম্পদ এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ কাউকে দান করা বা অপচয় করা জায়েজ নয়।

৩. নিজেকে পেশ করা (তামকিন): স্বামী যখনই বৈধ পন্থায় শারীরিক সম্পর্কের ইচ্ছা পোষণ করবে, স্ত্রীকে তাতে সাড়া দিতে হবে (যদি কোনো শরয়ী বা শারীরিক বাধা না থাকে)। বিনা কারণে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করা গুনাহে কবিরা।

৪. গৃহে অবস্থান: স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া, চাকরি করা বা সফরে যাওয়া স্ত্রীর জন্য অনুচিত। সংসারের প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে পর্দার সাথে এবং স্বামীর সম্মতিতে যেতে হবে।

৫. সদ্ব্যবহার ও সম্মান: স্বামীর সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা, তার মা-বাবা ও আত্মীয়দের সম্মান করা এবং তাকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দেওয়া। স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু দাবি না করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

এই অধিকারগুলো আদায় করলে নারীর জন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয় বলে হাদিসে সুসংবাদ রয়েছে।

৪৫. একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান কী? (ما هو حكم التعدد في الزوجات؟)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে বহুবিবাহ বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ একটি স্পর্শকাতর ও শর্তযুক্ত বিধান। ইসলাম এটি ঢালাওভাবে ফরজ বা ওয়াজিব করেনি, আবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধও করেনি। বরং বিশেষ প্রয়োজনে এবং কঠিন শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছে।

শরয়ী বিধান:

একজন মুসলিম পুরুষ একই সময়ে সর্বোচ্চ চারজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারেন। চারের অধিক স্ত্রী রাখা হারাম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

"তোমরা বিবাহ করো তোমাদের পছন্দমতো নারীদের মধ্য থেকে— দুই, তিন অথবা চারজনকে। আর যদি আশঙ্কা করো যে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তবে মাত্র একজনকে (বিবাহ করো)।"

শর্তাবলি:

একাধিক বিবাহের অনুমতিটি 'আদল' বা ন্যায়বিচারের কঠিন শর্তের সাথে যুক্ত।

১. সমতা রক্ষা: একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের মাঝে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সমতা বজায় রাখা স্বামীর ওপর ফরজ। কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং অন্যকে অবহেলা করা হারাম।

২. আর্থিক সামর্থ্য: সকল স্ত্রীর এবং তাদের সন্তানদের ভরণপোষণ দেওয়ার মতো যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা আবশ্যক।

৩. শারীরিক সক্ষমতা: সকল স্ত্রীর হক আদায়ের মতো শারীরিক শক্তি থাকা জরুরি।

সতর্কবাণী:

রাসুলুল্লাহ (সা.) হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, "যার দুইজন স্ত্রী আছে কিন্তু সে তাদের মাঝে ইনসাফ করেনি, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে তার দেহের এক পাশ অবশ বা ঝুলে থাকবে।"

সুতরাং, হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যদি কেউ ইনসাফ নিশ্চিত করতে পারে তবে তার জন্য একাধিক বিবাহ 'মুবা' বা জায়েজ। আর যদি ইনসাফ না করার আশঙ্কা থাকে, তবে একাধিক বিবাহ করা 'মাকরুহ' বা গুনাহের কারণ। এটি কোনো ভোগের লাইসেন্স নয়, বরং এতিম ও বিধবাদের আশ্রয় এবং সামাজিক প্রয়োজনে একটি সমাধান মাত্র।

৪৬. কখন স্ত্রীর নাফাক্বা (ভরণপোষণ) ওয়াজিব হয়? (متى تجب نفقة الزوجة؟)

উত্তর:

'নাফাক্বা' বা ভরণপোষণ হলো স্ত্রীর অন্যতম মৌলিক অধিকার, যা স্বামীর ওপর ফরজ। এটি মহরের পরেই স্ত্রীর সবচেয়ে বড় আর্থিক দাবি। তবে কেবল বিবাহ করলেই সাথে সাথে ভরণপোষণ ওয়াজিব হয় না, এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত বা অবস্থা পাওয়া যাওয়া জরুরি।

নাফাক্বা ওয়াজিব হওয়ার সময় ও কারণ:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, মূলত তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয়:

১. সহীহ বিবাহ: বিবাহ চুক্তিটি অবশ্যই শরিয়ত মোতাবেক সহীহ বা শুদ্ধ হতে হবে। বিবাহ যদি ফাসিদ বা বাতিল হয়, তবে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না।

২. তামকিন বা নিজেকে সমর্পণ: স্ত্রী নিজেকে স্বামীর আয়ত্তে সোপর্দ করতে হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসতে রাজি থাকতে হবে এবং স্বামীর সাথে বসবাস করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

- যদি স্ত্রী নাবালিকা হয় এবং সহবাসের উপযুক্ত না হয়, তবে তার ভরণপোষণ ওয়াজিব নয় (যতক্ষণ না সে উপযুক্ত হয়)।
- যদি স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকে এবং স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (বিনা কারণে), তবে সে ভরণপোষণ পাবে না।

৩. নাকল বা স্থানান্তর: স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে বা স্বামীর নির্ধারিত বাসস্থানে নিয়ে আসার পর থেকে ভরণপোষণ শুরু হয়।

বিশ্লেষণ:

হানাফি ফিকহে ভরণপোষণকে 'ইহতিবাস' বা 'আটক থাকা'র বিনিময় বলা হয়। যেহেতু স্ত্রী স্বামীর কারণে ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোনো উপার্জনের সুযোগ পায় না, তাই তার বেঁচে থাকার যাবতীয় খরচ (খাবার, কাপড়, বাসস্থান) স্বামীর দায়িত্ব। স্বামী গরিব হলেও তাকে এই খরচ জোগাড় করতে হবে। তবে স্ত্রী যদি 'নাশিজা' (অবাধ্য) হয়, অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বা স্বামীর অধিকার আদায় না করে, তবে যতক্ষণ সে অবাধ্য থাকবে, ততক্ষণ তার ভরণপোষণ রহিত বা স্থগিত থাকবে। আবার ফিরে এসে অনুগত হলে তখন থেকে পুনরায় ভরণপোষণ পাবে।

৪৭. কোন কোন দোষের কারণে ফাসখ (বিবাহ ভঙ্গ) করার ইখতিয়ার সাব্যস্ত হয়? (ما هي أنواع العيوب التي تثبت خيار الفسخ؟)

উত্তর:

বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য হলো দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তি। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যদি এমন কোনো জন্মগত বা রোগজনিত দোষ থাকে যা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা দেয়, তবে শরিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা 'ফাসখ' করার অধিকার দেয়। একে 'খিয়ারে ফাসখ' বা দোষের কারণে বিচ্ছেদের ইখতিয়ার বলা হয়।

দোষের প্রকারভেদ ও বিধান:

হানাফি ফিকহে মূলত স্বামীর দোষের কারণেই স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইতে পারে। প্রধানত তিনটি দোষকে বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়:

১. জুব্ব (Jubb): স্বামীর পুরুষাঙ্গ একেবারে না থাকা বা কাটা থাকা।

২. উন্নাহ (Unnah): পুরুষাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সহবাসে অক্ষমতা বা ধ্বজভঙ্গ রোগ (Impotence)।

৩. খাসি (Khasi): অণ্ডকোষ না থাকা বা অকার্যকর হওয়া।

হানাফি মাযহাবের মূল মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কেবল এই যৌন অক্ষমতা জনিত দোষগুলোর কারণেই স্ত্রী কাজীর কাছে বিচ্ছেদ চাইতে পারে। পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগ (Judham) বা ধবল রোগ (Baras)—এগুলো বিচ্ছেদের কারণ নয়। কারণ এসব রোগের সাথেও সংসার করা সম্ভব।

পরবর্তী ফতোয়া ও অন্যান্য মাযহাব:

তবে পরবর্তীতে হানাফি ফকিহগণ মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এবং মালেকি মাযহাবের মত গ্রহণ করেছেন। সেই অনুযায়ী—স্বামী যদি পাগল হয়, অথবা কুষ্ঠ ও ধবল রোগের মতো এমন কোনো সংক্রামক বা ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হয় যার কারণে স্ত্রীর সাথে থাকা অসম্ভব বা বিপজ্জনক, তবে স্ত্রী কাজীর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ বা ফাসখ করাতে পারবে।

প্রক্রিয়া:

যৌন অক্ষমতার ক্ষেত্রে কাজী স্বামীকে চিকিৎসার জন্য পূর্ণ এক বছর (চান্দ্র বর্ষ) সময় দেবেন। যদি এর মধ্যে সুস্থ হয়, তবে ভালো। আর না হলে কাজী বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দেবেন। এই বিচ্ছেদ 'তালাকে বাইন' হিসেবে গণ্য হবে।

৪৮. কখন সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হয়? (متى تنتهي العدة بوضع الحمل؟)

উত্তর:

'ইদ্দত' হলো বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর অপেক্ষার সময়কাল। সাধারণত ইদ্দত গণনা করা হয় মাসিক ঋতুচক্র (৩ হায়েজ) বা মাসের (৩ মাস

বা ৪ মাস ১০ দিন) হিসেবে। কিন্তু নারী যদি গর্ভবতী হন, তবে তার ইদ্দতের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং একক।

বিধান:

তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা—উভয় প্রকার নারীর ক্ষেত্রে, যদি তারা বিচ্ছেদের সময় গর্ভবতী থাকেন, তবে তাদের ইদ্দত শেষ হবে 'সন্তান প্রসবের' (Wad'ul Haml) মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

"আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।" (সূরা তালাক: ৪)

বিশ্লেষণ:

১. সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই: গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের কোনো নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই। এটি সম্পূর্ণ প্রসবের ওপর নির্ভরশীল।

- যদি তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর মাত্র **এক ঘণ্টা বা এক দিন** পরেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। সে তখন থেকেই হালাল হয়ে যাবে এবং অন্যত্রে বিবাহ করতে পারবে।
- আবার যদি গর্ভাবস্থার শুরুতে বিচ্ছেদ হয়, তবে তাকে নয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে সন্তান হওয়া পর্যন্ত।

২. গর্ভপাতের হুকুম: যদি পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব না হয়ে গর্ভপাত (Miscarriage) হয় এবং ভ্রূণের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন হাত, পা, আঙুল) গঠিত হয়ে থাকে, তবে এর দ্বারাও ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেবল রক্তপিণ্ড বের হয় এবং কোনো আকৃতি না থাকে, তবে তা প্রসব গণ্য হবে না; সেক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মে ইদ্দত পালন করতে হবে।

৩. বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তার অভিন্ন বিধান: যদিও সাধারণ অবস্থায় বিধবার ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন, কিন্তু গর্ভবতী হলে তার জন্যও ৪ মাস ১০ দিন শর্ত নয়, বরং সন্তান প্রসবই শেষ সীমা। এই বিধানটি নারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি শরিয়তের বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ।

৪৯. সাক্ষী ছাড়া সম্পন্ন হওয়া চুক্তির বিধান কী? (ما هو حكم العقد الذي خلا عن الشهود؟)

উত্তর:

ইসলামে বিবাহের ঘোষণা ও প্রচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোপনিকতা বা সাক্ষীবিহীন বিবাহকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। সাক্ষী ছাড়া বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হলে তার শরয়ী মর্যাদা বা হুকুম কী হবে, তা নিয়ে ফকিহগণের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

হানাফি মাযহাবের বিধান:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, সাক্ষীদের উপস্থিতি বিবাহ 'সহীহ' হওয়ার শর্ত। যদি কোনো নারী ও পুরুষ সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে গোপনে ইজাব ও কবুল করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে সেই বিবাহ 'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ) বলে গণ্য হবে। এটি 'বাতিল' (সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন) নয়, আবার 'সহীহ' (শুদ্ধ)-ও নয়।

ফলাফল ও হুকুম:

১. বিচ্ছেদ অপরিহার্য: যেহেতু বিবাহটি ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ, তাই স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের সাথে বসবাস করা জায়েজ নয়। তাদের ওপর ওয়াজিব হলো অবিলম্বে আলাদা হয়ে যাওয়া। যদি তারা আলাদা না হয়, তবে কাজীর দায়িত্ব হলো তাদের জোরপূর্বক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

2. সহবাসের প্রভাব: সাক্ষীবিহীন এই ফাসিদ বিবাহে যদি সহবাস বা দৈহিক মিলন না ঘটে, তবে এর কোনো আইনি ফলাফল নেই (মহর বা ইদ্দত লাগবে না)। কিন্তু যদি ভুলবশত তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করে এবং মিলন ঘটে, তবে:

- স্ত্রীকে **মহর** দিতে হবে (নির্ধারিত মহর ও প্রচলিত মহরের মধ্যে যেটি কম)।
- বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে **ইদ্দত** পালন করতে হবে।
- তাদের ঘরে কোনো সন্তান জন্ম নিলে সেই সন্তানের নসব বা বংশপরিচয় পিতার সাথে সাব্যস্ত হবে এবং সন্তান বৈধ গণ্য হবে।

৩. পাপ: সাক্ষী ছাড়া গোপনে বিবাহ করা গুনাহের কাজ এবং এটি ব্যভিচারের সন্দেহের উদ্রেক করে।

সারকথা, হানাফি মতে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ আইনত ত্রুটিপূর্ণ হলেও, এটি সন্তানের বংশ রক্ষার খাতিরে কিছু আইনি বৈধতা পায়, যা ইসলামি আইনের এক বিশেষ সতর্কতা ও কল্যাণকামিতা।